# জগদীশ গুপ্ত : বৈনাশিকের জীবনদর্শন ও শিল্পপ্রতিমা

গুণময় মান্না

পুরাণের গল্পে আছে, অষ্টাবক্র মুণি পথ চলতে গিয়ে দেখলেন, এক শিশু সর্বাঙ্গে এঁকেবেঁকে তাঁর সামনে সামনে যাচ্ছে। মহাক্রোধে তিনি উচ্চারণ করলেন, আমাকে ব্যঙ্গ করছিস? এখনই নিপাত যা। আর যদি ব্যঙ্গ না হয়, তাহলে তোর সমস্ত খঞ্জত্ব দূর হোক। মুহূর্তে শিশুটির দেহ সুঠাম এবং সর্ব অঙ্গ দেবদ্যুতিতে ঝলমল করে উঠল।

জগদীশ গুপ্তর গল্প-উপন্যাস হাতে নিলেই মনে হয়, কাহিনি চরিত্র ঘটনা-বিন্যাস প্রতিবেশ সবই যেন কী রকম, তেড়াবেঁকা, কিন্তু যদি কোনো বিদগ্ধ পাঠক কেবল বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত না করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন, লেখকের অভিপ্রায়টির সাক্ষাৎ পেয়ে যান, তাহলে দেখবেন এই রচনাগুলি কী আশ্চর্য সমৃদ্ধিতে দ্যুতিমান। এবং আমরা জানি, রচনার রূপ যাই হোক, তার যদি একটি কেন্দ্রীণ প্রাণবিন্দু থাকে, আর সেটি রচনার অঙ্গে প্রতিফলিত হয়, তাহলে সেটাই হবে সার্থক শিল্পসৃষ্টি।

জগদীশ গুপ্ত কিছু গল্প এবং উপন্যাসপ্রতিম গল্প লিখেছেন। এগুলি যে ঠিক গল্প হয়ে ওঠে নি, লেখক নিজেই বোধ করি সে সম্বন্ধে সবার থেকে বেশি সচেতন ছিলেন। বার বার তিনি নিবেদন করেছেন, 'ইহাতে 'প্লট' নাই— আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র; গল্প তৈরি আমার উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসসুলভ গল্পের বস্তুসংস্থান বা পুরপুষ্টি ইহাতে নাই' (ভূমিকা, *দুলালের দোলা*)। 'পাত্র হইতে পাত্রান্তর অবলম্বন করিয়া কথা অগ্রসর হইয়াছে— গতি পুনঃপুনঃ পথচ্যুত হওয়ায় গল্পের অখণ্ডতা ভগ্ন হইয়াছে মনে হইতে পারে;' (নিবেদন, *তাতল সৈকতে*)। এটা কি লেখকের শক্তিহীনতা? সমালোচকের পর সমালোচক কিন্তু জগদীশ গুপ্তের রচনার সারবত্তা স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথও, 'তাঁর *লঘু-গুরু* বইখানা পড়ে দেখলুম। লেখবার ক্ষমতা তাঁর আছে, একথা পূর্বেই জানা ছিল। এবারেও তার পরিচয় পেয়েছি।' সুতরাং তাঁর রচনার তথাকথিত বিসদৃশ্যতা অন্য কোন্ অন্তিম তাৎপর্য বহন করে তা ভেবে দেখা দরকার।

কালানুক্রমে সাজানো ঘটনার মালা হচ্ছে স্টোরি বা গল্প এবং 'A plot is also a narrative of incidents, the emphasis falling on causality'— ফর্স্টারের এই পরিচ্ছন্ন সংজ্ঞার আলোকে জগদীশ গুপ্তর উক্তির তাৎপর্য কী তা বুঝে নেওয়া যেতে পারে। চরিত্র ঘটনাকে টেনে আনে, আবার ঘটনা চরিত্রকে গতিশীল করে— এই

পারম্পর্য স্বীকার করে নেওয়া মানেই কার্য-কারণ সম্বন্ধটিকে টেনে আনা। ঘটনার কারণ রয়েছে চরিত্রে মনোবৃত্তিতে, আবার চরিত্রের ক্রিয়াকলাপের পিছনে ঘটনার ধাক্কাই কাজ করে। তার মানে, চরিত্রের হৃদয়বৃত্তি, তার স্নেহ-ভালোবাসা, কাম-জিঘাংসা সবই পরিজ্ঞাত বিষয়, বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ ভাবে সক্রিয় হয়ে একটা পরিণতিতে পৌঁছোয়। ট্র্যাডিশন্যাল উপন্যাসের প্লট-নির্মাণে সাধারণত এই জীবন-দর্শনই কাজ করতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্লট-নির্মাণে ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব তাই এত প্রকট, রবীন্দ্রনাথ আত্মিকতার অন্তঃপুরে দাঁড়িয়ে সমাজ ও জীবনের বিকাশশীল গতিময়তা পর্যবেক্ষণ করেন, শরৎচন্দ্র সমাজের চালচিত্রে (বিরুদ্ধতা ও আনুকূল্য সমেত) ব্যক্তিকে ফুটিয়ে তোলেন।

প্লট-নির্মাণের এই মৌল প্রবর্তনা কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধকে মেনে নেয়— ক. ঘটনার ও চরিত্র বিকাশের একটা কার্যকারণ পরম্পরা আছে; খ. জীবনে ও বিশ্বে সৎ ও অসৎ আছে এবং সে দুই এর টানা-পড়েন আছে; গ. মানুষ একটা পরিণামে পৌঁছোয়, তা সে কমেডি বা ট্র্যাজেডি যাই হোক না কেন; এবং ঘ. পরিণামটা বৃত্তাকার মনে হলেও তা প্রকৃতপক্ষে স্পাইর‍্যাল এবং উন্নত মানের।

জগদীশ গুপ্তের রচনায় প্লট-নির্মাণের এই মৌল শর্তগুলি হয় অনুপস্থিত, নয়তো, এক অদ্ভুত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আসে।

ক. কার্যকারণ পরম্পরা মানলেই ঘটনা-বিন্যাসের শৃঙ্খলা মানতে হয়। কিন্তু জগদীশ গুপ্তর ঘটনাগুলি এলোপাথাড়ি, মনে হয় না যে সে সবের কোনো ঐকমুখিন লক্ষ্যে পৌঁছনোর দায় আছে; যদিও একটা কিছু তাঁর গল্পে হয়ে থাকে— 'ঘটনাগুলিও পরস্পর বিচ্ছিন্ন, কিন্তু এক স্থানে যাইয়া ফল প্রসব করিতেছে' (ভূমিকা, *দুলালের দোলা*)। জগদীশ গুপ্তর জগতে একটা কিছু ঘটে এবং তার বিলয়ও হয়, কিন্তু কী কারণে ঘটে তা তাঁর জানা নেই— 'যা কখনো হয় নাই তা-ই হচ্ছে চিরটাকাল— কেমন করে হচ্ছে তা জানিনে; তবে যা সম্ভব বলে ভেবে রাখি, উল্টে গিয়ে তা অসম্ভবই ঘটে যায়' (*দুলালের দোলা*)।

এসব জিনিসকে পূর্বগামীরা কিন্তু একটা সুশৃঙ্খল নিয়মের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন। বঙ্কিম মানুষের গতি-পরিণতিতে কখনো দেখেছেন সমাজের ভূমিকা : 'আমি সাত হইতাম— কিন্তু দুই আর পাঁচে সাত— বিধাতা, অথবা বিধাতার সৃষ্ট লোক যদি আমাকে আর দুই দিত, তা হইলেই আমি সাত হইতাম।' (*বিষবৃক্ষ*); কখনো সেই ভূমিকা নিয়েছে প্রকৃতি : 'তুমি জড়প্রকৃতি!... তুমি অশেষ ক্লেশের জননী— অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি— তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী!' (*চন্দ্রশেখর*)। শরৎচন্দ্রের কল্পনায় অদৃষ্টের স্থান নেই, সমাজকেই তিনি ব্যক্তির পোষাক এবং বৈনাশিক রূপে দেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনার বিবর্তন আছে— প্রথম দিকের উপন্যাসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রেরই ঐতিহ্যবাহী, কিন্তু শেষের দিকে পৌঁছেছেন

তিনি অন্যখানে। দিনের প্রথম সূর্য এবং দিবসের শেষ সূর্য প্রশ্নে উচ্চারণ করেছে কিন্তু উত্তর পায়নি, তবু মানুষের জীবনকে তিনি দেখেছেন আত্মিক বিকাশের পরম বিশ্বাসময় প্রেক্ষাপটে। দুঃখ আছে, আত্মদান আছে কিন্তু বিনাশ নেই, এমন কি, 'যে পেয়েছে অনায়াসে ছলনা সহিতে,/সে পায় তোমা হতে অক্ষয় শান্তি অধিকার।'

জগদীশ গুপ্ত এই ঐতিহ্য থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন, উৎকটরূপে স্বতন্ত্র। মানুষকে তিনি নিশ্চিতরূপে রেখেছেন সামনে, তাকে অস্বীকার করবার উপায় তাঁর নেই, কিন্তু জানেন যে সে মানুষ কেবল বিনষ্ট হবার জন্যই। সেই বিনাশে যে প্রকৃতি জগদীশ গুপ্ত ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানেই জগদীশ গুপ্তকে ঠিক ঠিক চিনে নেওয়া যায়, ঐতিহ্যবাহী ট্র্যাজিক বিনাশের আলোকে নয়।

তাঁর সমালোচকদের দু'একটি প্রতিনিধিত্বমূলক মন্তব্য সামনে আনছি। 'মানুষের দৈন্য-কুশ্রীতা-নোংরামির জন্য জগদীশচন্দ্র সমসাময়িক 'আধুনিক' লেখকদের মতো সমাজের বা ব্যক্তির ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই।... তিনি কিছুকে বা কাহাকে হেতুভূত না করিয়া যে হিংস্র অন্ধ অদৃষ্টশক্তি মানুষের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলে, তাহার দিকে ইশারা করিয়াছেন' (সুকুমার সেন)। 'তিনি দেখিতেছেন, ভগবান, ধর্ম, নৈতিকতা এ সবই যে মিথ্যা শুধু তাহাই নহে, এ সংসারের যে বিধাতা সে এক নির্মম ক্রূরহৃদয় শয়তান' (অনিলবরণ রায়, 'আধুনিক সাহিত্যে দুঃখবাদ')। এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র তিনি লিখেছেন : 'প্রাচীন গ্রীসদেশীয় tragedy-তে নিয়তির (Doom, Necessity, Fate) খেলা বর্ণিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের শয়তানী শক্তির সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে।'

ট্র্যাজেডির বিনাশ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য মেনে চলে, অদৃষ্টবাদ তারই অন্যতম। কতকটা সেই কারণে উক্ত দু'জন সমালোচক অদৃষ্টবাদের কথা বলেছেন এবং স্বভাবতই সেই সূত্রে গ্রীক অদৃষ্টবাদের কথা এসেছে। অথচ অনিলবরণ রায় প্রথমেই বলে নিয়েছেন যে, 'কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোথাও তাহার তুলনা নাই বলিলেই হয়।' তাহলে?

জগদীশ গুপ্তর রচনায় বিনাশ আছে, কিন্তু যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোনো রচনা ট্র্যাজেডি হয় সেটাই অনুপস্থিত। তাঁর কোনো চরিত্রই মহৎ বা মর্যাদাসম্পন্ন নয়, এবং রচনার শেষতম প্রাপ্তিও Katharsis' এর মতো উন্নত-গম্ভীর উপলব্ধিতে নিয়ে যায় না পাঠককে। অদৃষ্টের উপস্থিতি তাঁর কোনো রচনায় নেই, কেবল 'দিবসের শেষে'-র মতো ব্যতিক্রম জাতীয় গল্পে কামদা নদীতে কুমিরের মধ্যে তার চকিত আভাস মেলে। এ ব্যাপারে গ্রীক অদৃষ্ট, ভারতীয় ভাগ্য, শেক্স্পীয়রের নিয়তি বা হার্ডির প্রকৃতি কারুর সঙ্গে জগদীশ গুপ্তের রচনার তুলনা হয় না। সুতরাং তাঁর রচনায় অদৃষ্টের কথা বলা পূর্বনিরূপিত (preconceived) ধারণার আরোপ মাত্র। এবং সেদিক থেকে সুকুমার সেনের উক্তির

প্রথমাংশের 'সমাজের বা ব্যক্তি ঔদাসীন্য, ঘৃণা বা লুব্ধতা দায়ী বলিয়া দেখান নাই। ... তিনি কিছুকে বা কাহাকে হেতুভূত না করিয়া' কথাগুলিই যথার্থ।

জগদীশ গুপ্তর মানুষ মানুষই, তাকে সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণমুক্ত মৌল সত্তাতেই (element, essence) তিনি দেখেছেন। রতিকান্তর পাঁচ বছরের ছেলে সকালে উঠেই বলল, 'মা, আজ আমায় কুমিরে নেবে,' এবং দিবসের শেষে তাকে কুমিরেই নিয়ে গেল। এটাকে কোনো রকমে টেনেটুনে অদৃষ্টবাদ বলা হয়তো চলে; কিন্তু এটা বলাই সঙ্গত যে এই মানবকটি একটি আবর্তনের শেষে ফুরিয়ে গেল। লেখকের *লঘু-গুরু* উপন্যাস, যা রবীন্দ্রনাথেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল, মানুষের এই হেতুহীন ফুরিয়ে যাওয়ার একটি সুন্দর নিদর্শন। এ গল্পে নায়িকা উত্তম পতিতা, তা পতন কেন হয়েছিল? 'জন্মগত সংস্কার, শিক্ষার শাসন, গৃহের-হাওয়া, সম্বিতের উন্মুখতা, বিবেকের অঙ্কুশ এতগুলি শক্তি যে দিকে টানিতেছিল— স্খলিত হইয়া তাহারই বিপীরত দিকে কি করিয়া আসিয়াছিল!' আবার, পক্ষান্তরে, যদিও পতিতা নারীর অন্তরস্থিত নারীত্ব-মাতৃত্বের কথা শরৎচন্দ্র প্রমুখরা বলেছিলেন, উত্তম কিন্তু যখন বিশ্বম্ভরকে আশ্রয় করল টুকীর মা সেজে বসার জন্য, তখনও তার কোনো আপাতগ্রাহ্য কারণ লেখক দেখান নি— 'এই বিশ্বম্ভর লোকটিকে কেন সে আশ্রয় করিয়াছে... তার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি কিছুই নাই।' জগদীশ গুপ্ত যেন বলতে চান, মানুষ এই রকম পতিতা হয়, সে একটা ঝোঁক তাকে পেয়ে বসে, তখন বহুর সেবা করে অর্থ বা অলংকার অর্জন করতে তার শৈথিল্য নেই— যেমন মা সেজে বসার পর যে ঝোঁক পেয়ে বসে, তাতেও ত্যাগ ও তপস্যার কোনো কুণ্ঠা নেই।

একে কি প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারালিজ্‌ম্‌ বলা যায়?

জগদীশ গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের মতোই একবার বলেছিলেন, তাঁর রচনাই পাঠকের সামনে থাক, লেখক-পরিচিতি এবং ব্যক্তি-পরিচয় অপ্রসাঙ্গিক। কথাটা অনেক দূর পর্যন্ত সত্য, শেষ পর্যন্ত নয়। কেননা, নানা অসংগতি সত্ত্বেও লেখকের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে তাঁর সাহিত্য-কর্মে এবং সেই সাহিত্য-প্রতিমা লেখকের ব্যক্তিত্বকেও গড়ে তোলে।

জগদীশ গুপ্ত মফঃস্বলবাসী, নির্লিপ্ত। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক হয়েও তিনি কল্লোলের মজ্‌লিসে উপস্থিত থাকেন নি। অচিন্ত্যকুমার তাঁকে বলেছেন : 'অন্তরালের সাহিত্যিক'। ভবানী মুখোপাধ্যায় তাঁর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন, 'গৃহহীন, সম্বলহীন, সন্তানহীন জগদীশ গুপ্ত ছিলেন সর্ববন্ধন বিমুক্ত সন্ন্যাসীর মতো। ব্যাধি তাঁকে কাতর করেনি, দারিদ্র্য বিচলিত করে নি, যে সম্মান ও স্বীকৃতি তাঁর চেয়ে অনুপযুক্তেরাও পেয়েছেন, তিনি পান নি, তার জন্যে কোনো অনুতাপ করেন নি। নির্লোভ, নির্লিপ্ত চরিত্র তাঁর। চোখে ছিল এমন একটা সংযত প্রসন্নতা, দেখলে মন তৃপ্ত হত।'

এই শেষ বাক্যটি লক্ষ করার মতো। জগৎ ও জীবনকে জগদীশ গুপ্ত দেখেছেন তৎসংস্থিত রূপে। তার পিছনে কোনো মহত্তর উদ্দেশ্যও দেখেন নি, তার অপঘাত প্রচার

করাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সম্বন্ধে কখনোই বলা যায় না যে, 'তিনি সর্বত্র দেখিতেছেন শয়তানী' (অনিরবরণ রায়), কিংবা, 'মানুষের জীবনে একটা অতিশয় দয়াহীন, দুর্জ্ঞেয় দৈবনির্যাতন' (মোহিতলাল)। জগদীশ গুপ্তর সম্বন্ধে এমন কথা বললে, প্রথমটির ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত অর্থে দেবত্ব স্বীকার করতে হয়, আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে মানুষের জীবনের বাইরে কোনো শক্তিকে— যার কোনোটি মেনে নিতে জগদীশ গুপ্ত রাজি নন। তাঁর চোখ অনাসক্ত প্রসন্নতার সঙ্গে মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, প্রেম-জিঘাংসা সবগুলিকে ক্রিয়াশীল হতে দেখেছে এবং সেগুলিকে তিনি একটা নতুন সন্নিবেশ-প্যাটার্ন দিয়েছেন। 'কল্পনা বা মনোগত রাগ-বিরাগ এবং ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির সংস্কারমুক্ত হইয়া জীবনকে অকুণ্ঠিতভাবে দেখিবার যে ভঙ্গি, অথচ তাহাতেই একপ্রকার রসাস্বাদের যে প্রবৃত্তি, তাহাই সাহিত্যের 'রিয়ালিজ্‌ম্,' আর একটু ব্যাপক বা মূল-সন্ধানী হইলে তাহাই 'Naturalism'-এ পরিণত হয়' (মোহিতলাল)। জগদীশ গুপ্তর রচনা প্রকৃত প্রস্তাবে গভীরের মূল-সন্ধানী, যে নামেই তাকে চিহ্নিত করা যাক না কেন।

খ. জগদীশ গুপ্ত কি জীবনের সৎ এবং অসৎ-এ বিশ্বাসী? এর উত্তর সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায়, এখানেও তিনি ট্র্যাডিশন্যাল কবি-মনীষী-সাহিত্যিকের থেকে পৃথক।

কমেডিতে শুভ-অশুভ সুস্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত। ট্র্যাজেডিতেও শুভ-অশুভের টানাপোড়েন আছে। 'সকল দেশের সকল Tragedy-র পিছনেই একটা moral order আছে, নৈতিক নিয়মের শৃঙ্খলা আছে... কোথাও বড় রকমে কোন অন্যায়, অত্যাচার, পাপ সংঘটিত হইলে সংসার তাহা বরদাস্ত করে না, চতুর্দিকে একটা বিষম উপদ্রবের সৃষ্টি হয় এবং সেই পাপের কারণকে সংহার না করিয়া সে উপদ্রব শান্ত হয় না। কিন্তু ঐ উপদ্রব শুধু পাপীকে, দোষীকেই সংহার করে না, সেই সঙ্গে নিরপরাধীও সাজা পায়' (অনিলবরণ রায়)।

এ দৃষ্টিভঙ্গিতে লক্ষণীয় যে শুভ-অশুভের পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব স্বীকৃত এবং শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে অশুভের বিনাশ হয় তাও ধরে নেওয়া হয়েছে। যাকে 'অশুভ' বলা হয়, জগদীশ গুপ্তের রচনায় তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে : সদু খাঁর লালসা জসিমের বউকে গ্রাস করেছে ('প্রলয়ঙ্করী ষষ্ঠী'), নষ্টা কুট্টিনী সুন্দরী— টুকীর সতীধর্মে নখ বসিয়েছে। (*লঘু-গুরু*), শরতের নিভৃতাবাসে আত্মরক্ষার দুর্গে এসে পড়েছে অলকাতিলকাধারিণী কৃষ্ণকায়া মাংসলদেহা রমা বৈষ্ণবী, 'আমার কপাল। তুমি এখানে।' (*তাতল সৈকতে*)। রবীন্দ্রনাথ *লঘু-গুরু*-র দ্বিতীয় পর্যায়ের নায়ককে বলেছেন 'কোমরবাঁধা সয়তান'। এত সব সত্ত্বেও জগদীশ গুপ্ত ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখেন। তিনি বলতে চান, কেউ যদি এগুলোকে 'অশুভ' 'পাপ" আখ্যা দিতে চায় তো দিতে পারে, কিন্তু ও দুটো মোটেই একেবারে স্বতন্ত্র জিনিস নয়। জগদীশ গুপ্তর রচনায় দেখা যাচ্ছে তিনি জীবনের বৈপরীত্য স্বীকার করেছেন, তাদের যুগ্মতাও, দেখেছেন একটা জাগলে আর একটা জাগে। বিড়াল

যেমন শিকার নিয়ে বসে থাকে, শিকার যতক্ষণ মুহ্যমান হয়ে থাকে ততক্ষণ সে কিছু করে না, নড়লেই কামড়ে ধরে, মানুষও তেমনি যেই মাত্র সক্রিয় হয়, না হয়ে তার উপায় নেই, অমনি তার বিনাশকে ডেকে আনে বিপরীত ঘটমানতার দ্বারা। সুতরাং লঘু-গুরু, পাপ-পুণ্য অশুভ-শুভ এবং একটার সঙ্গে আর একটা বাঁধা থাকে, কখনো গাঁটছাড়ার মতো প্রান্তিকতায়, কখনো সমপাতিত্বে। কখনো চকচক করে উঠছে কখনো কালো হয়ে যাচ্ছে। মানুষ একবার এদিকে পা ফেলবে, তারপর ঠিক ওদিকে। পতিত উত্তমের কথা একটু আগেই উল্লেখ করেছি : সে ভালো ছিল, সে হাঁটল এবং খারাপ হল, আবার হাঁটল ভালো হল, তারপরও পা ফেলল, টুকীকে বিনষ্ট করল, নিজেকেও (*লঘু-গুরু*)। সিদ্ধার্থ ঋণের জ্বালায় যূপনিক্ষিপ্ত জীবের মতো হয়ে উঠল, দলিল জাল করল অর্থলোভে, তখন তার 'মনে হল' এই অবস্থায় লোকে আত্মহত্যা করে, 'অতএব' সে আত্মহত্যা করার জন্য পাহাড়ে খাদের ধারে গিয়ে দাঁড়াল, 'অকস্মাৎ' দৃশ্যপটে প্রাণ ও সৌন্দর্যের প্রতিমা অজয়ার আবির্ভাব ঘটল। তখন তার 'মনে হল' এখন সাধু হওয়া দরকার এবং এমনকি প্রেম করাও (*অসাধু সিদ্ধার্থ*)। 'মনে হল', 'অতএব', 'অকস্মৎ'— এগুলি কোনো নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা সূচিত করছে না। এগুলি অত্যন্ত যদৃচ্ছ, কিন্তু একটা কিছু হয়েই থাকে। সর্বোপরি, জগদীশ গুপ্তর মানুষ যদিও বিনষ্ট হয়ে থাকে, শুভ-অশুভ কখনোই বিনষ্ট হয় না, এবং কোনো moral order সূচিত হয় না।

গ. ট্র্যাডিশন্যাল কমেডিতে খলচরিত্র অনিবার্যরূপেই আসে, দুটি কাজ করে, অন্তিমে সে নিজেকে সরিয়ে নেয় বা বিনষ্ট হয়, আর সৎ চরিত্রের সে মিলন ঘটায়, শুভ বা মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করে। ট্র্যাজেডিতে শুভ-অশুভের দ্বন্দ্বে দুইই বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু সর্বব্যাপক সর্বাতিক্রামী moral order বিনষ্ট হয় না— 'তাই সে চিত্র দেখিয়া মানুষ অমঙ্গলের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়ে না। ... জগতে যে মূল শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহা যে এইরূপ নির্মমভাবে পাপকে অন্যায়কে অত্যাচারকে নির্মূল করিতে করিতে চলিয়াছে, ইহা দেখিলে প্রাণে আশারই সৃষ্টি হয়' (অনিলবরণ রায়)।

কমেডিতে, এবং ট্র্যাজেডিতেও এই যে পরিমাণ-মঙ্গল, তা একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয়। কমেডিতে নায়ক সহজ ভাবেই খলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং পরিণামে মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা করে। ট্র্যাজেডিতে নায়ক প্রতি পদক্ষেপে যে বিরুদ্ধতা জাগ্রত করে তোলে, তাতে ভয় এবং করুণার সঞ্চার হয়। তাছাড়া এর motivation-এও অনন্যতা আছে, ভালো করতে গিয়েই তা মন্দকে টেনে আনে : We remain confronted with the inexplicable fact or the appearance of a world, travailing for perfection, but bringing to birth an evil, which it is able to overcome only by self-torture and self-waste' (Bradley)।

এসব ঐতিহ্যবাহী ব্যাপারের সঙ্গে জগদীশ গুপ্তর রচনার আপাত-সাদৃশ্য আছে,

সগোত্রতা, নেই। আপাতত মনে হতে পারে, উত্তম টুকীকে আশ্রয় করে নারীর অন্তর্নিহিত মাতৃত্বকেই অনুভব করতে চাইছিল, ব্যাপারটা তাহলে শুভ উদ্দেশ্য। কিন্তু বিশ্বম্ভরের সঙ্গে সে যে চলে এসেছিল, সে কেবল 'চার চোখের' মিলন হয়েছিল এবং উভয়েই 'মনের মানুষ' খুঁজে পেয়েছিল বলেই। (*লঘু-গুরু*)। সিদ্ধার্থ বসু যে সব রমণীয় বাক্য বলেছে, যে সব কাজ করেছে সেগুলো সব অগত্যায় করা, যেন ভান (*অসাধু সিদ্ধার্থ*)। জিতু যে কমান্ধতার শ্বাসরোধকারী বৃত্ত থেকে বেরিয়ে শরৎকে মাতৃমূর্তিতে গ্রহণ করল, সেটাকে সংগ্রাম বলা যাবে? পলায়নের মুখে আবর্তনের আর এক পিঠ নয় কি? (*তাতল সৈকতে*)। এক আধটা চরিত্রে ব্যতিক্রম নেই তা নয়, শরৎ শুভ উদ্দেশ্যেই সক্রিয় হয়েছে, ফল হয়েছে অশুভ। (ঐ)

বস্তুত, জগদীশ গুপ্তর কল্পনায় মানুষের যদিও গতি আছে (তা কেবল একটা আবর্তন মাত্র এবং একই তলে বিধৃত), পরিণতি নেই; মানুষ কেবল পা বাড়ায় এবং শুভ-অশুভের জাল বুনে চলে। অশুভ বিনষ্ট তো হয়ই না, শুভও বিনষ্ট হয় না (তথাকথিত শুভ এবং অশুভ)। দুটি উদ্ধৃতি পার্শ্ববিন্যস্ত করে দেখা যাক;

'পাপের ইচ্ছায় নহে, প্রলোভনে নহে, আত্মকৃত পাপে অনুশোচনায় নহে, একজনের স্খলিত জীবনের পাপের জ্ঞান তাহারই বুকে সঞ্জীবিত হইয়া রহিয়াছে— তাহাকে নামাইবার স্থান নাই, তাহাকে হত্যা করিবার উপায় নাই— তার ছটফটানির অন্ত নাই।' (*দুলালের দোলা*)

'চিরন্তনী কন্যা এ—বধূ, স্ত্রী, জননী— শরতের আকাশ যেমন অনাবিল, ইহার জীবনও আদি প্রান্ত হইতে কল্পনায় যতদূর দেখা যায় সেই শেষতম প্রান্ত পর্যন্ত তেমনি ছায়াহীন অনাবিল—পৃথিবীর কাহারো দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে তাহার সঙ্কোচের হেতু নাই।' (*লঘু-গুরু*)

একটি পাপের চিত্র, অন্যটি পুণ্যের। লক্ষণীয় যে দুটিই অক্ষয়, চিরন্তন। আরও একটু লক্ষ করতে হবে যে, প্রথমটি সতীশের উপলব্ধি, যে সতীশের পিতামহী স্খলিতা, কিন্তু যে সতীশ 'পাগল' হলেও নিজে সৎ, স্ত্রী-কন্যাকে সে অসতী বলে কিন্তু তারা সতী। অর্থাৎ পুণ্যের ভূমিতে পাপের চেতনা। আবার দ্বিতীয়টি উত্তমের উপলব্ধি, যে নিজে পতিতা। এখানে পাপের ভূমিতে পাপের চেতনা। জগদীশ গুপ্ত বলতে চান, এই দুই ব্যাপার পরস্পরের সঙ্গে জড়িত, দুই-এর কোনোটাই বিনষ্ট হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই সমাপতিত। তাঁর উপন্যাসগুলোর নামেও এ ইঙ্গিত রয়েছে, *লঘু-গুরু*— লঘুর সঙ্গে গাঁটছড়াবাঁধা গুরু, গুরুর সঙ্গে লঘু; *অসাধু সিদ্ধার্থ*— সিদ্ধার্থ পুণ্যনাম ঠিকই, কিন্তু সেটা ছদ্মনাম, অসাধুতাই সিদ্ধার্থতা, সিদ্ধার্থতাই অসাধুতা। দুলাল নামের কেউ নেই, তবু *দুলালের দোলা* নাম কেন? বাবা-মা যে ছেলে যা নয় তাকেই তার আবরণ পরায়, সেই দুলাল। আমরা আদর করে মানুষকে-গ্রামকে-সমাজকে যা-নয় তাই দুলাল সাজিয়ে রেখেছি; তারই একটা দোলা —

one round of swinging, up and down—'এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখানো হইয়াছে।' (ভূমিকা, *দুলালের দোলা*)

তাই বলছিলাম যে জগদীশ গুপ্তর কল্পনায় পাপ-পুণ্যের পরিণাম নেই, চিরন্তনতা আছে, যুগ্মতা আছে— একই পাত্র বা পাত্রান্তর বা ব্যক্তি-সমাজের যুথতাকে অবলম্বন করে।

ঘ. মহৎ চরিত্র একটা বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হলে ট্র্যাজেডি হয়। সাধারণ মানুষও নায়ক চরিত্র হতে পারে যদি ঘটনাচক্রে সে ব্যক্তিত্ব সমান প্রাধান্য (লেখক ও পাঠকের মনোযোগে) পায়। নায়ক চরিত্রের বিনাশের মধ্যেই তার মহত্ত্বের সর্বাধিক বিকাশ হয়— 'The purest reality, the purest beauty, the purest love, cannot by its own nature, manifest itself on earth without disaster, but in disaster it can.' (Middleton Murray)। তাছাড়া, ট্র্যাজেডির অভিনয় দর্শনে সহৃদয়চিত্তে ঘটে ভাবমোক্ষণ, Katharsis— সেটা চিত্তের একটা উত্তুঙ্গ উপলব্ধি। ট্র্যাজেডিতে চরিত্রের যে পরিণাম ঘটে, তাতে ফিরে আসা পরিধির মুখ উঁচুতল অবলম্বন করে, সেটি স্পাইর‍্যাল মুভমেন্ট।

জগদীশ গুপ্তর গল্প শেষ হলে এসবের কোনোটাই হয় না।

তাঁর কোনো চরিত্রই eminent বা মহৎ নয়। ট্র্যাজেডির নায়ক অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং সক্রিয়, 'To be weak is miserable—doing or suffering'— এই হচ্ছে তার মটো। স্মতর্ব্য যে গ্রীস ও ইংলণ্ডের অসম্ভব সমৃদ্ধি ও আত্মপ্রসাদের যুগে সোফোক্লিস বা শেক্সপীয়রের আবির্ভাব ঘটেছিল। জগদীশ গুপ্তর কোনো চরিত্রই সেই অর্থে একেবারেই সক্রিয় নয়, They are more acted upon than acting। সিদ্ধার্থ যা কিছু করেছে, তা অন্য মানুষ ও ঘটনার চাপে; শরতের জীবনে মনোহর দত্ত অকস্মাৎ এসে গিয়েছিল, পরেই আবির্ভাব ঘটল তার রক্ষিতা সুখীর। তার পরে পথে জিতু তাকে মা বলে গ্রহণ করল, ইত্যাদি।

সীতার পাতাল প্রবেশেই সম্পূর্ণ সীতা, মৃত্যুতেই প্রতাপের সম্পূর্ণ প্রতাপত্ব, নদীবক্ষে বিসর্জিতা হবার মুখেই কপালকুণ্ডলার শ্রেষ্ঠ নারীরূপ। জগদীশ গুপ্তর চরিত্রগুলির মৃত্যু বা ব্যর্থতায় এই রকম কোনো পূর্ণতার উপলব্ধি হয় না, টুকীর মতো এক আধটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তাছাড়া, এই মৃত্যুতে ভাবমোক্ষণ হয় না, এবং পাঠকে জগতের 'inexplicable mystery'-র সম্মুখীন করে উন্নত চিন্তাবস্থায় পৌঁছে দেয় না।

কাজেই জগদীশ গুপ্তর প্রতিপাদ্যটিকে এইভাবে সাজানো যায় : মানুষ মহৎ নয়, ক্ষুদ্র নয়, মানুষ মানুষ। জীবনের আবর্তনে একটা লেবেল ওঠে তাকে মহৎ বলি, অন্যটা উঠলে বলি নিচ, এ দুয়ের টানাপড়েনের কয়েকটা পাক দিতে দিতেই সে শেষ হয়ে যায়।

এরপর তাঁর দু'একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাস আমরা সামনে আনছি।

## দুই. তাতল সৈকতে

এ উপন্যাসের তিন পর্যায়। কাহিনির উদ্ঘাটন হয়েছে শরৎকে কেন্দ্র করে। এক কালে সে বর্ধিষ্ণু পরিবারের কুলবধূ ছিল, তার শ্বশুরের 'সম্ভ্রান্ত সজ্জন' বলিয়া মান ছিল। তিনি উপার্জন করিতেন প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্মী একদিন বিমুখ হইলেন। যে পথে টাকা আসিত, অতর্কিত দৈব দুর্ঘটনায় এক দিন সেই পথেই তাঁর শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।' শ্বশুর মারা গেল, অল্প দিন পরে স্বামীও। শরৎ এখন একা, নিতান্ত দরিদ্র, নিতান্তই নিঃসঙ্গ। তার বিচ্ছিন্নতা এত বেশি যে শরতের দুকুঠরি ঘরের মধ্যে একটিতে ভাড়াটে বসাতে হয়েছিল।

ঢেউ উঠে গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সেখনেই সে স্থির থাকে না, আবার ওঠে। শরতের সর্বরিক্ততার প্রেক্ষাপটে এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারই বালকপুত্র শান্ত এবং তার মাতৃত্ব। চিত্তর কথায়, 'কেঁদোনা, বৌ, চোখের জল মোছো... তোমার মত ছেলে-কাতুরে মেয়ে আমি দেখেছিত' কি বলেছি!'

তারপরই সেই একই প্রেক্ষাপটে, ফুটে উঠল মাতৃত্বের বিপরীত কালো রঙ; মনোহর দত্ত গণিকা ভেবে তাকে সম্বোধন করে বসল— লক্ষণীয় যে শরৎ যখন নির্জন রাস্তায় ছেলের জন্য সোৎকণ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই মুহূর্তটিতেই। কালো রক্ত গাঢ়তর হতে চাইল যখন এরপর শরতের কাছে আবির্ভাব ঘটল মনোহর দত্তের রক্ষিতা সুখীর। এবং শরৎ যতই অতর্কিত আঘতে লাফিয়ে উঠুক না কেন, 'চিত্ত, শান্তকে সরিয়ে নে যা; যা যা— এক মুহূর্ত দেরি করিসনে... মাথা খাস, ওর কানে যেন একথা না যায়।... বলিতে বলিতে ছুটিয় যাইয়া সে দুই হাতে শান্তর দুই কান বন্ধ করিয়া ধরিল,— তবু সুখী নাপ্তিনী তাকে শুনিয়ে গেল, 'আয়, আমার সঙ্গে আয়; আমার ঘরে থাকবি। নিত্যি নতুন নাগর এনে দেবো, কাব্‌লি, মেড়ো, খোট্টা।... ভিজে বেড়ালটি আমার, নেকী, মুখে রা শব্দটি নেই। ... ঘরে থেকে ডুবে ডুবে পরের জলে নোলা ভেজাবি কতদিন?'

এর প্রতিকারও নেই, কেননা যদিও 'কলঙ্ক মিথ্যাই, কিন্তু মানুষের জিহ্বা যে তাহাকে ছড়াইয়া বেড়াইতেছে ইহা ত' মিথ্যা কিছুতেই নয়।' অর্থাৎ শরতের অন্তরে উজ্জ্বল মাতৃত্ব কিন্তু বাইরে কলঙ্কের কালো পর্দার আবরণ সৃষ্টি হল।

ইউটেলিটারিআন বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রও এর জন্য সমাজকে দায়ী করবেন, আধুনিক বস্তুবাদী বা সাম্যবাদীরাও সেই দিকে ইঙ্গিত করবেন। জগদীশ গুপ্ত মৃদু হেসে হয়তো বলবেন, তা বলতে পারো, কেননা একটা কার্য-কারণ না দেখালে আর নাম না দিলে আজকালকার দিনে চলে না; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মানুষ নামক জীবটির ব্যাপারই ওই রকম, তার সমস্ত চেষ্টিতই শ্লেষাত্মক, ironical, তাতে একটার ওপর আর একটা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

এরপর শরৎ গৃহত্যাগ করে গেল। এবং জগদীশ গুপ্ত এখন শরৎকে সরিয়ে তাঁর

ক্যামেরার আলোকপাত করলেন একুশ বৎসরের তরুণ জিতুর ওপর। এটাই উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্যায়। গল্পের শেষ পর্যন্ত জিতুই প্রধান, যদিও শেষাংশে আবার দেখা দিয়েছে শরৎ।

এখানে ট্র্যাডিশন্যাল সমালোচনায় বলা হবে, আর সে কথা ঠিকই যে, কাহিনির ঐক্য খণ্ডিত হয়েছে। লেখক নিজেও সে সম্বন্ধে সচেতন, 'পাত্র হইতে পাত্রান্তর অবলম্বন করিয়া কথা অগ্রসর হইয়াছে— গতি পুনঃপুনঃ পথচ্যুত হওয়ায় গল্পের অখণ্ডতা ভগ্ন হইয়াছে মনে হইতে পারে,' কিন্তু তবু তিনি নাচার। কারণ, যে বিপরীতের যুগ্মতা তাঁর লক্ষ, তার জন্য পাত্রান্তর অবলম্বন অবান্তর নয়, বরঞ্চ বৈচিত্র্যের মধ্যে উদাহৃত হলেই তার জেল্লা বাড়ে। জগদীশ গুপ্তের মনোলোকের দিকে তাকিয়ে আমরা একে ত্রুটি বলে অভিহিত না করে তাৎপর্যপূর্ণই মনে করব। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশও গ্রাহ্য, 'বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কত দূর কৃতকার্য হইয়াছেন। পূর্ব হইতে একটি অমূলক প্রত্যাশা ফাঁদিয়া বসিয়া তাহা পূর্ণ হইল না বলিয়া লেখকের প্রতি দোষারোপ করা বিবেচনাসংগত নহে।'

জিতুর কথা। শরৎকে যেমন আমরা দেখেছিলাম পারিবারিক বিত্তহানির পটভূমিতে প্রথম দেখা দিতে, জিতুর ক্ষেত্রেও তাই। তার পিতামাতা মৃত, সম্পত্তি আছে বটে তবে তা পিতৃগুরুর দ্বারা রক্ষিত। সে এসেছে অন্যের আশ্রয়ে, নিশিকান্ত কবিরাজের গৃহে শিক্ষানবিশির জন্য। একদিকে জিতু নিরালম্ব, অন্যদিকে আশ্রয়স্থ। তারপর সেখানে সে আর এক যুগ্মতার সৃষ্টি করতে লাগল। একদিকে সে কবিরাজি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করছে, বাসুদেবের সংগীতের পরিমণ্ডলে লালিত হচ্ছে, সকলেরই জিজ্ঞাসা তার ক্ষয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে; অন্যদিকে কবিরাজের নববিবাহিতা কন্যা কেতকীর দুরন্ত যৌবনের প্রতি সে পতঙ্গবৃত্ত হয়ে উঠেছে। ওষুধ খাচ্ছে সে মন্মথরস, কিন্তু তার স্বাস্থ্য ভালো না করে তা কেবল মন্মথজ্বরে তাকে ক্ষয়ই করছে। জিতু শত প্রয়াসেও তার প্রতিকার করতে পারছে না, 'এ যেন দ্বাদশ সূর্যের অখণ্ড একত্র উদয়, তেমনি নির্মম, আর তেমনি দাহ, সে তেমনি দুর্নিরীক্ষ্য;'।

অবশেষে ঠিক শরতের মতোই জিতুও কবিরাজবাড়ির আশ্রয় ছেড়ে পালিয়ে গেল নিজের গৃহের অভিমুখে। পথে শরৎ-শান্তর সঙ্গে তার দেখা হল, মিলন হল কামের কালোছায়াতাড়িত দুই ব্যক্তির; শরৎ মা, শান্তর সঙ্গে জিতুও ছেলে। উপন্যাসের এটি তৃতীয় পর্যায়। এই নতুন অথচ বিপরীত তরঙ্গে— মাতৃচ্ছায়ায় দু'দিনে জিতু বদলে গেল। যার চেহারা এমনি দাঁড়িয়েছিল যে তাকালে যে কেউ চমকে উঠত, তার এখন, 'বুকে চোখের কোণে আর গালে মাংস লাগিতেছে, শরীরের রং ফিরিতেছে। বাসুদেব আচার্য এখন তাহাকে দেখিলে বোধ হয় গানের সুর ভুলিয়া যাইতেন।'

ঠিক এই সময়েই আবার সেই কালো ছায়া দেখা দিল, যাকে শরৎ-জিতু এড়িয়ে

পালিয়ে এসেছিল। পড়শিদের অবিশ্রান্ত তীক্ষ্ণ কৌতূহল শরতকে গৃহত্যাগিনী কলঙ্কিতার ভূমিকায় ঠেলে দিতে লাগল, যার চরম স্তরে আবির্ভূত হল রমা বৈষ্ণবী। জিতুর মনে শরতের পবিত্রতা সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিল— অর্থাৎ, তার মনে শরতের মাতৃমূর্তি গেল ভেঙে। এবং শরৎ পুকুরের জলে ডুবে আত্মহত্যা করল।

আলো-কালোর টানাপড়েন ভালোই হয়েছে, নয় কি?

*লঘু-গুরু*

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র উত্তম, পতিতা। দুটি পর্যায়, প্রথম পর্যায়ে পুরুষ চরিত্র বিশ্বম্ভর, দ্বিতীয় পর্যায়ে পরিতোষ। বিশ্বম্ভরের সঙ্গে উত্তমের যখন যোগ হল, তখন পটভূমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কালো। বিশ্বম্ভর পত্নীঘাতী, কন্যার সম্বন্ধে দায়িত্ববোধহীন। উত্তম অর্থের বিনিময়ে বহুচারিণী। কিন্তু একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে, খেয়াঘাটে চার চোখের মিলন হবার ফলে উভয়েই 'মনের মানুষ' খুঁজে পেল। এরপর গড়ানে নিম্নমুখ পথে উভয়ের জীবন বয়ে গেলেই ঠিক হত। কিন্তু জগদীশ গুপ্ত মনে করেন, তা হয় না, মানুষের জীবন অন্য রকম।

বিশ্বম্ভরের মনে হল, উত্তমকে বাড়ি নিয়ে যাবে, টুকীর মা সাজিয়ে। উত্তমও যেন পোষা বিড়ালী, সে ব্যবসা ছেড়ে দিল, গৃহিণী হল, এবং টুকীর আন্তরিক মা হতে চাইল। লেখক এখানে আশ্চর্য নিপুণ ভাবে মানবজীবনের শ্লেষাত্মক বা ironical ভঙ্গিমাটি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতি ঘটনায় বা উপাখ্যানে সেই ভঙ্গিমা যেন ঝলমল করছে।

বিশ্বম্ভর মেরুদণ্ডহীন মানুষ। তার স্ত্রী ছিল হিরণ, রক্ষিতা হয়েছে উত্তম। উত্তমকে সে যথেষ্ট সমীহ করতে আরম্ভ করল, তার ব্যক্তিত্ব এবং/বা অর্থের জন্য; কিন্তু তাকে দিল সে প্রকৃত স্ত্রীর ভূমিকা, যে প্রকৃত স্ত্রী নয়। এই সময় হিরণের কথা তার প্রায়ই মনে হত— হিরণ অমুক করত, অমুক বলত এইসব— কখন? না, হিরণ যখন নেই। আর উত্তম— সে টুকীর মা-র ভূমিকায়, যখন সে সত্যিই মা নয়, পতিতা। পাঠকের কি শরৎচন্দ্রের ব্যাখ্যা মনে আসছে— পতিতা নারীর অন্তর্নিহিত মাতৃত্ব? নারীর বহুচারিতার মাঝখানেও দুর্মর সতীত্ব? ঘটনা-সাদৃশ্য সেই রকম হলেও জগদীশ গুপ্ত সে পথে যান নি। তিনি বলেই দিচ্ছেন, 'এই বিশ্বম্ভর লোকটিকে কেন সে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা তার নিজের কাছে মাঝে মাঝে জটিল একটি সমস্যার মত মনে হয়— মনে হয় অর্থহীন— তাহার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি কিছুই নাই— অন্তরের দিকে চাহিলেও চোখে পড়ে, সেখানে বিশ্বম্ভরের স্থান অতিশয় সংকীর্ণ।'

মানুষের এইরকম পালা বদল হয়, তার কারণ নেই, একটা অব্যবহিত কারণ টেনে-হিঁচড়ে বের করে আমরা যতই তৃপ্ত হই না কেন। লেখক উত্তম চরিত্রে তার যথেষ্ট উদাহরণ দিচ্ছেন। তার সব কিছু থাকা সত্ত্বেও উত্তম কেন স্খলিতা হয়েছিল তার যেমন

কোনো যুক্তি নেই (উদ্ধৃতি আগেই নিয়েছি। শরৎচন্দ্রের শেষ বয়সে অসম্পূর্ণ রচনা *'শেষের পরিচয়'*-এ সবিতা কিন্তু অকারণেই স্খলিতা হয়েছিল; বিস্ময়ের বিষয় এই যে ওখানে শরৎচন্দ্র সমাজকে দায়ী করেন নি)— তেমনি এরও কোনো উত্তর নেই কেন 'গৃহবাসিনী হইয়া লালিত হইবার, লালন করিবার ইচ্ছার উত্তেজনা তাহাকে...' পেয়ে বসেছিল।

উত্তম ঘর সাজাচ্ছে, টুকীর পড়াশুনো করাচ্ছে, তার নিজের সমস্ত অর্থ-অলংকার টুকীর বিবাহে দান করছে, টুকীকে অনবরত শেখাচ্ছে 'পতি পরম দেবতা'-মন্ত্র— কিন্তু আমরা ভেবে দেখতে পারি, এই যে নারীকে যে গড়ে তুলেছে, সে-নারী সে নিজে নয়, তার কলঙ্ক কোনো দিন যাবে না, এমন কি, ভাগ্যের পরিহাস (irony) এই যে টুকীও যে সতীধর্ম শিখেছে সেটা এক অসতী নারীর কাছে। উত্তমের অধুনা ত্যাগ, তপস্যা কিংবা টুকীর অর্জন মোটেই অনান্তরিক নয়, কিন্তু সে সবের ভিত নেই, বরঞ্চ শাদা কাপড়ের তলায় কালোর রঙ দেখা যাচ্ছে।

টুকীর বিয়ে হল, শিক্ষিতা সুদেহা সুন্দরী রুচিমতী পতিমন্ত্রে দীক্ষিতা— কোথায়? লেখক তাকে স্থাপন করেছেন এক সর্বৈব ভণ্ডামি আর অশুচি পরিবেশে। পিতার অপেক্ষা বয়স্ক স্বামী পরিতোষ নির্ভেজাল শয়তান; গৃহে তারই রক্ষিতা সুন্দরী টুকীর অভিভাবিকা! সুন্দর শ্লেষ— বৈপরীত্যের সমাপাত। কিন্তু আরও একটু সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে, সেটা টুকীর জীবনকে কেন্দ্র করে। টুকীর নিজের সত্তা যেন নিজের নয়, তার ওপর উত্তমের দুই জীবন যেন যুগপৎ সক্রিয়, তাকে বলা যেতে পারে উত্তমের proxy। এক দিকে উত্তমের পতিতা জীবনেরই সংস্করণ যেন সুন্দরীর মধ্যে, আর অন্যদিকে মা-উত্তমের অহরহ অনুশাসন 'কোনো অবস্থাতেই স্বামীকে লঘু ভাবিও না, ভাবিতেও নাই' কথাগুলিতে।

*লঘু-গুরুর* সমপাত লেখক আশ্চর্য নিপুণভাবেই ফুটিয়েছেন।

টুকী উত্তমের শ্লেষবাহী প্রতিচ্ছায়া, কিন্তু গল্পের শেষে সে একবারই জেগে উঠল সেই ছায়া কাটিয়ে, আর সেই মুহূর্তেই তার বিনাশ ঘটল। কুট্টিনী সুন্দরী তার উপপতি জুটিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করেছিল, স্বামী পরিতোষেরও নেপথ্য ভূমিকা ছিল তাতে। কিন্তু মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় পা বাড়াতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে সুন্দরীর হাতে টাকা দেখে চট্‌কালেগে তার ঘোর কাটল। কী মর্মান্তিক কথা দেহকামী পুরুষ অচিন্ত্যকে বলল শুনুন, 'এ-কাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?' উত্তমের এত সাধের গড়া সতীমূর্তি গেল ভেঙে। শুধু তাই নয়, টুকীর অধিকার-ঘোষণার, আত্মসচেতনতার মুহূর্তেই তার নিজের সত্তাও লুপ্ত হয়ে গেল, 'সুন্দরীর বাড়ির চৌকাঠ পার হইয়া সে বাহিরে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যাইয়া দাঁড়াইল।'

একথা ভেবে নেওয়া ভুল হবে, যেহেতু আমরা এপর্যন্ত দেখেছি জগদীশ গুপ্তের রচনা ট্র্যাডিশন্যাল দুঃখবাদ বা ট্র্যাজেডি নয়, সেজন্য তাঁর রচনায় ঐতিহ্যের সঙ্গে কোনো যোগ নেই। ট্র্যাডিশন্যাল আর্টফর্মের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ-ঘোষণাও করেন নি। শুধু এইটুকু তাঁর শিল্পী-মনের ভাবনা যে সেই আর্টফর্ম ছিল তাঁর আত্মপ্রকাশের পক্ষে অপর্যাপ্ত। তাঁকে বরঞ্চ সাহসী এবং প্রতিভাবন শিল্পী বলা যায় এই জন্য যে, প্রচলিত আর্টের উপাদানগুলো নিয়েই তিনি তাতে নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছেন; ব্যাপারটা সূক্ষ্ম তাই সহজে চোখে পড়ে না।

*অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসে প্রচলিত রীতির অনেক ঘটনাই তিনি সামনে টেনে এনেছেন— অভাবের তাড়নায় জাল করা, ঋণের জ্বালায় আত্মহত্যার চেষ্টা, নায়িকার আবির্ভাব, দেখামাত্র প্রেম, ফুলের তোড়া ছুঁড়ে প্রণয় নিবেদন, নায়িকার ভাইকে বিপদ থেকে উদ্ধার— কিন্তু এসবের প্রত্যেকটি ঘটনাকে তিনি আপাত গ্রহণ করেছেন, তাঁর নিজের কথা বোঝাবার জন্য যে, মানুষের একই চেষ্টিতের উল্টো পিঠে আর এক বিপরীত জিনিস রূপ পেতে থাকে। তিনি শুভবাদী নন, অশুভবাদীও নন, পরিষ্কার অর্থেই জীবনবাদী। পাপ-পুণ্য দুটোকেই তিনি অস্বীকার করেছেন এই জন্য যে, কোনোটির কোনো চরম মূল্য নেই; আবার স্বীকার করেছেন এই ভেবে যে আপেক্ষিক মূল্যে ও দুটোই জীবনে জড়িয়ে রয়েছে। সিদ্ধার্থকে মনে হয়, প্রতি মুহূর্তে সে অভিনয় করে চলেছে, তার সুখের এবং দুঃখেরও, ভালো করাটাও তার ভালো করা নয়, মন্দটাও যেন ঠিক মন্দ নয়, সে আর একটা কিছুর proxy দিয়ে চলেছে।

উপন্যাসের নাম এবং নায়কের নাম— সিদ্ধার্থ বলতে যে পুণ্যতা মনে আসে, অসাধু বিশেষণ যোগ করলে তার ভিত্তিমূলটাই খণ্ডিত করা হয় যেন। নায়কের কল্পনাটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, নটবর সিদ্ধার্থ বসুর নাম পরিচয় বহন করে চলেছে। এই ঘটনাটি লেখকের উদ্ভাবনী শক্তির চমৎকার নিদর্শন : ভেতরে নটবর বাইরে সিদ্ধার্থ বসু। এই বৈপরীত্যের জন্য তিনি মানুষকে পাপী চিহ্নিত করেন নি। সিদ্ধার্থ যে ভান করবে সেটা তার পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না বলেই; আরও, অন্যরাও তার সেই ভূমিকা গ্রহণে পোষকতা করেছে। জগদীশ গুপ্ত বলবেন, আমি আর কী করব, জীবনটাই তো তাই। বাইরে যার 'ঋজু বলিষ্ঠ দেহ; বর্ণ গৌর; মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। এমনি করিয়া সে মাটিতে পা ফেলিয়া চলে যেন পৃথিবীর যাবতীয় প্রতিকূলতা আর বিমুখতা সে অতীব অবজ্ঞার সহিত দু-পা দিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছে।'— তারই উল্টো দিকে 'ভিতরে সে শ্রান্ত, অতিশয় পরমুখাপেক্ষী।' এক সঙ্গে দুটো জিনিসকেই সে বহন করে চলেছে। কাহিনির প্রারম্ভে আমরা দেখছি, সিদ্ধার্থের 'ঋণ মিলিতেছে না; মিলিতেছে কেবল ঋণ পরিশোধ করিবার অসহিষ্ণু কঠিন তাগিদ।' আশ্চর্য এই যে সিদ্ধার্থের, মানে মানুষের বন্ধুরাই মহাজন। আর মহাজনই তাকে পত্রে জানাচ্ছে, 'তোমার দেহে কান্তি আছে, সৌষ্ঠব আছে, সর্বাঙ্গে তোমার লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করিতেছে;

তোমার বাক্য প্রাণস্পর্শী, তোমার গাম্ভীর্য শ্রদ্ধেয়, তোমার মাথা হেলাইবার ভঙ্গী চমৎকার...'। মানুষ সম্বন্ধে এসব কথা লেখার সময় জগদীশ গুপ্তের ঠোঁটের কোণে মিটিমিটি কিন্তু হাসিতে নিশ্চয়ই পেট ঘুলিয়ে উঠেছিল।

বস্তুত, জগদীশ গুপ্তের সমস্ত জীবনবীক্ষা, ঘটনাবিন্যাস, শব্দযোজনা আগাগোড়া ironical, দায়ে পড়ে মানুষ এক এক মুহূর্তে এক এক রকম হয়, একই মুহূর্তে দু'রকমও হয়। জীবনের আবর্তনে দুই বিপরীত রঙিন বুদবুদের মতো ভেসে ওঠে, পালাক্রমে বা যুগ্মকে। দেখুন না, সিদ্ধার্থের বন্ধু-মহাজন প্রস্তাব করেছিল একশো টাকার বিনিময়ে দলিল জাল করতে, তাতে সিদ্ধার্থের সে কী অপমানবোধ!— 'মানুষের মনে কতদূর গভীর ইতরতায় বিশ্বাস জন্মিলে তবে সে এ হেন প্রস্তাব হইয়া আর এক জনের টাকার লোভ দেখাইতে আসিতে পারে।'—কিন্তু দু'একটা কড়া তাগিদ মাত্র, তারপরই 'আমি রাজি। রাসবেহারীর প্রস্তাব অতি সাধু প্রস্তাব। কাল সকালে যাবো।'

যুধবদ্ধ যূথচারী মানুষ পোকার মতোই কিলবিল করছে, কখনো ওপরে কখনো নিচে। ঘটনায় পড়ে মানুষ জাল করে, তার পরে তার গ্লানিবোধও হয়, তারপরে সে চেনা-জানা শহর থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে, নির্জন পাহাড়ের খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আত্মহত্যার সংকল্পও করে। তার বিপরীতটাও মানুষ করে, মানে, মানুষের জীবনে ঘটে যায় আর কি। গল্পে-উপন্যাসে যে সব প্রথম দর্শনে প্রেম, নারীকে অবলম্বন করে অধঃপতিত পুরুষের উদ্ধার, সে সবও হয়ে যায়। অজয়াকে দেখে 'তার শীতল রক্ত দেখিতে দেখিতে জ্বরাক্রান্তের নাড়ীর মত উদ্দাম হইয়া উঠিল। অতলে গর্জন করিতেছে মৃত্যু। কিন্তু সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল অশেষ জীবনের নিগূঢ় ইঙ্গিত— অসীম আঁধার সাগরের উপর জ্যোতির্ময় শতদল ফুটিয়া উঠিয়া তাহারই অঙ্গপ্রভায় দিগন্ত পর্যন্ত স্বর্ণপ্রভাতের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।' এই বর্ণনাটি, এবং এই রকম বর্ণনা, যেন কোনো রোমান্টিক লেখকের প্যারডি— জগদীশ গুপ্ত একটু ব্যঙ্গের হাসি বুলিয়ে দিয়েছেন কিন্তু তাৎপর্যে তিনি খুব গম্ভীর, জীবনটাই ওই রকম প্যারডি। মানুষ ঘটনা ঘটায় বা তার জীবনে ঘটনা আসে। যখন সে ঘটাচ্ছে তখন তার প্রণোদনা (motivation) কতখানি সত্য? এরূপ অবস্থায় আর পাঁচ জন আত্মহত্যা করতে যায়, সিদ্ধার্থও যাচ্ছে, সুতরাং এ প্রণোদনা চরম বা exclusive হতে পারে না। পারে না যে তার প্রমাণ সে সত্যিই আত্মহত্যা করল না, সেখান থেকে আর এক প্রণোদনায় সরে গেল অর্থাৎ ভালোবাসল। তখন সিদ্ধার্থ, বা মানুষ 'মনে করে, যা করিতেছে তা ছাড়া উপায়ান্তর নাই; কিন্তু অনতিবিলম্বেই চেতনার মূর্ছা কাটিয়া সহস্র পথ দেখিতে পাইয়া তার মর্মদাহের অন্ত থাকে না, সুতরাং এই সব চলমান উপলব্ধি, চলমান কৃত্য, চলমান ঘটনার অনিবার্যতা (Necessity) আছে, কিন্তু কোনোটাই চরম নয়, আপেক্ষিক।

সিদ্ধার্থের যা কিছু কাজ তার খাঁটি মূল নেই বলেই তাকে মনে হয় ভান, লোকটাকে

মনে হয় অসাধু। সে ফুলের তোড়া ছুঁড়ে গেছে, নায়িকার দাদাকে মৃত্যুর মুখ থেকে উদ্ধার করেছে, দেশ-প্রেমিকের বুলি আউড়েছে এবং ঠিক সময়ে মূর্ছা গেছে, চোখ চেয়ে ঠিক কথাই বলেছে, 'আমি কোথায়? অজয়া—' কিন্তু ঠিক সেইগুলোই তার এবং তার পরিমণ্ডলের—অন্য মানুষগুলির পক্ষে সত্য। যেমন, অজয়া দাদার বন্ধুকে প্রত্যাখ্যান করে সিদ্ধার্থর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, বারবার সিদ্ধার্থ নায়িকার চোখে দেখেছে স্বীকৃতি এবং শুনেছে সখী ননীর মারাত্মক উক্তি, 'দুটিতে মিলে কি হচ্ছে?' সুতরাং প্রেম ছাড়া সে আর কী করতে পারত?

যাই হোক, অসাধুতা-সিদ্ধার্থতায় মিলিত পরিস্থিতিরও শেষ হয়। যখন সিদ্ধার্থের সঙ্গে অজয়ার বিবাহ সব দিক থেকেই স্থিরীকৃত, তখন দৃশ্যপটে আবির্ভূত হল সিদ্ধার্থ বসুর মাতামহ কাশীনাথ— 'সিদ্ধার্থর যে আর এক দণ্ড পরমায়ু; সে যে বাঁচবে না।'

অজয়ার ব্যাপারটাও তাই, তিলে তিলে সে যে প্রেমিক আর স্বামীকে মনে মনে গড়ে তুলেছিল, তা ছিল একেবারেই 'অমূল তরু'— জগদীশ গুপ্ত ওটাই বলতে চান : মানুষের সমস্ত পাপ-পুণ্য এই রকমই অমূল, rootless। তাই মূহূর্তে অজয়ার— মানুষের— আর একটা পাক খেতে কোনো অসুবিধে হয় না, 'দাদা, ওঁকে যেতে বলো।'

এই কারণে সিদ্ধার্থ জারজ, মানুষের সমস্ত সত্তাই চরমতাহীন, arbitrary। লেখকের এই উদ্ভাবন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ভীষণ তুলনা করতে ইচ্ছে করছে গোরার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ গোরাকে জারজ বলেন নি, সে গোঁড়া ব্রাহ্মণ রূপে যখন দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে তখন হঠাৎ সে জানতে পারল যে সে ম্লেচ্ছ-সন্তান। এইরকম আরো দুটি উদ্ভাবনার উল্লেখ করছি— ১. সিদ্ধার্থ যাত্রার দলে কথা বলার পটুতা অর্জন করেছিল— অভিনয়, proxy, মানুষ মাত্রেই অভিনেতা; ২. সিদ্ধার্থর যে বরবপু অজয়াকে মুগ্ধ করেছিল, অর্থের বিনিময়ে তা-ই এক বৃদ্ধা বারাঙ্গনার ভোগে লেগেছিল, fidelity and infidelity both!

## তিন

আমরা দেখেছি, ট্র্যাডিশন্যাল রীতিতে প্লটে ঐক্যবিধান করা, এবং বিভিন্ন উপাখ্যান বা episode-এর মধ্যে একটা কার্যকারণ-পরম্পরা সৃষ্টির সম্বন্ধে জগদীশ গুপ্ত শৈল্পিক কারণেই উদাসীন ছিলেন। এখন ঘটনা-চয়নে ও বিন্যাসে তাঁর কৃতি কোন সার্থকতায় পৌঁছেছে তা দেখা যাক।

আধুনিক জীবনচর্যা দাঁড়িয়ে রয়েছে ধনিকতন্ত্রের মুদ্রা-অর্থনীতির ওপর। মুদ্রা-অর্থনীতির উদ্ভব-যুগে যে সব মনীষী শিল্পী আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁরাই এর সর্বগ্রাসী বিপরীতকারী শক্তি সম্বন্ধে সচেতন। শেক্স্পীয়র লিখেছেন—

Gold? yellow, glittering, precious gold?.../Thus much of this will make

black white; foul fair;/Wrong right; base noble; old young; coward valiant. (Timon of Athens)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর *সুবর্ণগোলক* রসরচনায় দেখাচ্ছেন, কী ভাবে সুবর্ণগোলক প্রভুর হাত থেকে ভৃত্যের হাতে গেলে প্রভু নিজেকে মনে করে ভৃত্য, ভৃত্য মনে করে প্রভু; পুরুষ নিজেকে মনে করে স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোক পুরুষ; এবং এই সব হাত বদলের ফলে সুবর্ণগোলকটি কীভাবে দুর্বোধ্য জটিলতার সৃষ্টি করে। *কৃষ্ণকান্তের উইল* উপন্যাসে উইল-প্রণয়ন ও পরিবর্তন প্রতি স্তরে নরনারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিল গ্রন্থিযোজনা করেছে।

জগদীশ গুপ্ত জীবনাবর্তনে যে সাদা-কালো পাপ-পুণ্যের ওঠা-পড়া দেখিয়েছেন, তাতে অর্থের এটা আপেক্ষিক ভূমিকা আছে। সিদ্ধার্থ অর্থের জন্যই জাল করতে প্রস্তুত হয়েছিল শুধু তাই নয়, অজয়ার প্রতি তার ভালবাসার মধ্যেও অর্থের ভাবনা ছিল। শরতের জীবন-নাট্য শুরু হয়েছে তার পতিকুলের নিদারুণ আর্থিক বিপর্যয়ের ওপর। টুকীর সতীমূর্তি ভেঙে পড়ার পিছনে সুন্দরীকে দেওয়া অচিন্ত্যের কয়েকটি টাকা অনিবার্যরূপে কাজ করেছে। সতীশের পিতামহীর কলঙ্কের জট সুদূরপ্রসারী এবং তার মূলে রয়েছে হরিশ ঠাকুরের অর্থলালসায় বিদেশগমন। পিরুর কথায়, 'একথা মিছে না যে মানুষের পয়সা তখন ছিল কম। আমারই মনে পড়ে, আস্ত একটা রূপোর টাকা দেখেছিলাম জোয়ান বয়সে— তার আগে দেখি নাই। এখনকার মত লোকে রোজই ভাতে না মলেও, কাঁচা পয়সার মুখটা তেমন দেখতে পেত না। কাঁচা পয়সার লালসেই মানুষ তখন বিদেশে বেরুতে লেগেছে...।'

প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের কাছেই আমরা সমকালীন সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা প্রত্যাশা করি। এগুলি তারই উপাদান মাত্র। তাছাড়া, উপন্যাসে আমরা জীবনের অজস্রবিধ বৈচিত্র্যও দেখতে চাই, জগদীশ গুপ্তের কৃতিত্ব সে বিষয়ে কতখানি?

'পরকীয়া প্রেম বস্তির দুঃখ পতিতা ও নির্যাতিতা নারী— আজকাল আমাদের গল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু এগুলিই প্রায়।... ইংরেজী যে-কোনো গল্পের পত্রিকা খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, তাহার মধ্যে humour আছে, uncanny আছে, race, detective, mystery, sea, war, navy, airship ইত্যাদি কত রকম যে আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।'

জগদীশ গুপ্তের এই পত্রাংশ থেকে বোঝা যায়, তিনি সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, ঘটনা-সঞ্চয়নে যথাসাধ্য বৈচিত্র্য-সাধন করবার চেষ্টাও করেছিলেন— গর্ভিণী স্ত্রী মদের চাট দিতে দেরি করলে স্বামীর তাড়নায় তার মৃত্যু, বেশ্যাকে পাড়ার মধ্যে ঘরে এনে তোলা, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরের আশ্রম বানানো ও অবতার সেজে বসা (*লঘু-গুরু*); কামদা নদীতে যেখানে কোনো পুরুষে কেউ কুমির দেখে নি সেখানে কুমিরের আবির্ভাব ('দিবসের শেষে'); মৃতের অশরীরী উপস্থিতি শিশুকে শুষে ফেলেছে ('তৃষিত আত্মা')— এই রকম কিছু ব্যতিক্রম জাতীয় ঘটনা তাঁর রচনায় আছে। কিন্তু সাধারণত পরিচিত ও ব্যবহৃত

ঘটনাগুলিকেই তিনি বেছে নিয়েছেন স্বকীয় বিশেষ কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য। এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধি অনেক বেশি।

একভাবে দেখলে, জগদীশ গুপ্তের রচনায় ঘটনা-সঞ্চয়ন বিশেষত্ব-বর্জিত। *অসাধু সিদ্ধার্থ* উপন্যাসের ঘটনাগুলির প্রত্যেকটি এইরকম হাত-ঘোরা (second hand)— এবং সেগুলো ইচ্ছাকৃত, এই জন্যে যে চেনা ঘটনাতেই তিনি অচেনা তাৎপর্য দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর সম্ভাব্য ব্যাখ্যান আমরা আগেই গ্রহণ করেছি।

কোনো কোনো সমালোচকের কাছে জগদীশ গুপ্তের ঘটনা-বিন্যাস অনেক ক্ষেত্রেই শক্তিহীনতার পরিচায়ক। *দুলালের দোলা* উপন্যাসের বিভিন্ন ঘটনার অপকর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে পশুপতি ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'আর শেষকালে একটা সামান্য অজুহাতে practical joke স্বরূপে চুরির কাণ্ডটা ঘটালেন, কোনো তৃতীয় শ্রেণীর লেখকও বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে এমন অদ্ভুত ব্যাপারের অবতারণা করেন না।'

তা হতেও পারে, লেখকের কল্পনাশক্তি সর্বদা এবং সর্বত্র সজাগ থাকে না, তখন যে কোনো ঘটনাকেই তিনি সামনে টেনে আনেন। শুধু জগদীশচন্দ্র কেন, বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের রচনাতেও এর নজির আছে। জগদীশ গুপ্ত সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলা যায় যে, ঘটনা সম্বন্ধে তিনি অনেক সময়েই নিরপেক্ষ ছিলেন— অক্ষমতার জন্য নয় তাঁর বক্তব্য প্রতিপন্ন হয়েছে এতেই তিনি খুশি। যেমন ধরুন, পল্লীর সৌন্দর্য দেখে এবং পিসিমার স্নেহের পরিচয় পেয়ে যে আনন্দ নীরদবরণ পেয়েছিল, গ্রামের জাতবিচার ইতরতা প্রভৃতির সম্মুখীন হয়ে তার বিনাশ ঘটল— 'এখানে একজনের আনন্দের উদ্ভব এবং লয় দেখানো হইয়াছে।' সমস্ত কাহিনিটাই schematic এবং সেদিক থেকে এই রকম ঘটনা-বিন্যাস মার্জনীয় অপরাধ। লেখক নিজেই বোধ হয় সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তাই লিখেছেন, 'উপন্যাস বা গল্পের সংজ্ঞার অধীনে আনিয়া ইহাদের বিচার না করিয়া প্রবন্ধ হিসাবেই যদি কেহ ইহাদের বিচার করেন তবে বিস্মিত হইব না।' এর ওপর কী বলবেন বলুন।

উপন্যাস-নাটকে ঘটনার চরমতা আছে, যা রচনার কেন্দ্রীয় কল্পনা, নাটকীয় পরিস্থিতি, চরিত্রের প্রবণতা সব মিলে সেই consummate incicent-টিকে সৃষ্টি করে তোলে। চকিত আলোর স্ফূরণে সমস্ত জীবন-নাট্যটি তখন ঝলমল করতে থাকে— শুধু তাই নয়, ঘটনাটি ঘটে যবার পরও তৎস্থানিকতাকে ডিঙিয়ে সমস্ত রচনায় তখনও তার প্রভাব কাজ করতে থাকে। দুর্গপ্রাকারে হ্যামলেটের পিতার প্রেত দেখা, ডেসডিমোনার রুমাল হারানো, হার্ডির 'টেস্' গল্পে একটু কুমারীসুলভ লজ্জায় পার্কের গেটে দাঁড়ানো প্রেমিকের সঙ্গে কথা বলতে না পারা— এ সবই consummate incident-এর উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিককার উপন্যাসে প্রায়ই এই রকম চরমতার সম্মুখীন হওয়া যায়। একটি উদাহরণ নিচ্ছি :

'গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে স্থাপিত করিয়া— রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।'

'সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া, এটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।'

দুটি ঘটনা— তার মধ্যে দ্বিতীয়টি অত্যন্ত সাধারণ, নিরপেক্ষ, এতে ভ্রমর চরিত্রের কোনো প্রবণতা সূচিত করে না, ঘটনাটা পেরিয়েও কোনো তাৎপর্য প্রকাশ পরায় না; যদি ভ্রমরের হাত থেকে বাসন পড়ে গিয়ে ভেঙে যেত, তাতেও একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। পক্ষান্তরে, প্রথম ঘটনায় গোবিন্দলালের সদাপরদুঃখকাতরতা সূচিত হচ্ছে, ঘটনার বাচ্যার্থ (মৃতকল্পকে বাঁচাবার জন্য মখে ফুৎকার) পেরিয়ে আর এক ঘটনা উঁকি মারছে— নায়ক কর্তৃক নায়িকার প্রথম মুখচুম্বন, মৃতকল্প রোহিণীর চিত্রে মৃত্যুমুখিন কামনার সংকেত। নিশ্চিতই অন্য কোনো ঘটনা এর বিকল্প হতে পারত না, এমনি এর চরমতা।

জগদীশ গুপ্তের রচনায় এই রকম চরমতার ঘটনা বেশি নেই, হয়তো তাঁর সৃজনী প্রতিমার পক্ষে তার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝেই তিনি এমন ঘটনার অবতারণা করেন, যা সমস্ত পরিস্থিতিকে বিদ্যুচ্চকিত করতে পারে। *দুলালের দোলা* উপন্যাসে নায়ক নীরদবরণ সকালে গ্রাম-পরিক্রমায় বেরিয়েছে, প্রকৃতির সৌন্দর্য, তার আলোছায়ার লীলা তার নয়নমনকে মুগ্ধ এবং অন্তরকে রসাবিষ্ট করে তুলেছে। হঠাৎ সে একটি গাভীকে দেখতে পেল,

'দেখিয়াই মনে হইল যে সুলক্ষণা এবং সযত্নপালিতা। কৃশতা তার কোথাও নাই— সুডৌল দেহ, সুকৃষ্ণ রোমাবলী মসৃণ।... হঠাৎ একটা লালসা জন্মিল— তাহারই বশে ধীরে গাভীটির পৃষ্ঠের উপর করতল স্থাপিত করিতেই স্পৃষ্টস্থান থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল— হাত টানিয়া লইলাম; কিন্তু তাহার গায়ের গরমটা কি আরামপ্রদ! হাতের সঙ্গে সে উত্তাপ উঠিয়া আসিয়া লাগিয়া রহিল।'

এর পরেই সরলহৃদয় এবং গাভীগর্বিত মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, 'আমার নাম আরজান সেখ।—সালাম।' অনেক বর্ণনাতেও যা হতে পারত না, এই গাভী ও আরজানের সালাম তাই প্রত্যক্ষ করে তুলেছে, সমস্ত পল্লীর সৌন্দর্য, পিসিমার স্নেহ, আরজানের প্রীতি এই ঘটনাচিত্রটির মধ্যে চরমতা পেয়েছে।

*তাতল সৈকতে* উপন্যাসে এই রকম আরো একটি আশ্চর্য ঘটনা আছে। কবিরাজ-কন্যা কেতকী উদ্ভিন্নযৌবনা, তাকে কেন্দ্র করে দিনে দিনে কামনার অগ্নি জিতুকে দগ্ধ করেছে, সে কৃশ থেকে কৃশতর হচ্ছে, তার প্রতিকার নেই। একদিন সকালে বিপর্যস্ত সে যখন মাঠে মাঠে ঘুরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল, এবং মাতৃসমা কমলার জিজ্ঞাসার উত্তরে এক গ্লাস জল চাইল, তখন—

'কেতকীর কণ্ঠস্বর কানে যাইতেই সে তার মুখের দিকে না চাহিয়া চাহিল তার

পায়ের দিকে; দেখিল রক্তবর্ণ বসনপ্রান্ত তার চরণতল চুম্বন করিয়া আছে... আর তরুণ রৌদ্র তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে... দেখিয়াই রণজিতের কি অদ্ভুত লালসা জন্মিল কে জানে... তাহার জ্ঞান যেন ঘুলাইয়া ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল... চক্ষের নিমেষে সে বসিয়া পড়িয়া কেতকীর পায়ের দশটা আঙ্গুল দুই হাতের দশটা অঙ্গুল স্পর্শ করিয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।'

উপন্যাসের প্লট এবং ঘটনার গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সর্বাধিক গুরুত্ব বোধ হয় মানুষচরিত্রগুলির। একমাত্র human interest-এর জন্যই কোনো উপন্যাস অসীম চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতে পারে।

জগদীশচন্দ্রের প্লট-নির্মাণ এবং ঘটনা বিন্যাস সম্বন্ধে যেমন বিরূপ সমালোচনা আছে, তেমনি আছে তাঁর চরিত্র-চিত্রণ সম্পর্কে। আমাদের এতাবৎ আলোচনায় দেখেছি যে, জগদীশ গুপ্তের রচনাকে তাঁর মানসিকতার পটভূমিতে একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সহজেই চিনে নেওয়া যায়, চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও কথাটি একইভাবে প্রযোজ্য।

রবীন্দ্রনাথ *লঘু-গুরু* উপন্যাস পড়ে লেখকের সম্বন্ধে দুটি গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন। প্রথমত, 'এই উপন্যাসে যে লোকযাত্রার বর্ণনা আছে, আমি একেবারেই তার কিছু জানিনে। ... লেখক নিজেও হয়তো ও-জায়গায় উঁকি মেরে এসেছেন।' অর্থাৎ লেখক যে সব চরিত্র তাঁর উপন্যাসে এনেছেন, সামাজিক সাধারণের অভিজ্ঞতায় তার সায় নেই শুধু তাই নয়, লেখকের নিজেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল কিনা, তা সংশয়ের বিষয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর চরিত্র-চিত্রণ খণ্ডিত, অবিশ্বাস্য, পাঠকের মনোলোকে তা সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করে না— 'বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের দরকার। সে-প্রমাণ মিথ্যে সাক্ষ্যের মতো বানিয়ে তোলা হলেও চলে, কিন্তু তাতে সত্যের স্বাদ থাকা চাই। সাহিত্যিক এই বলে হলফ করে, আমার কথা যতই মিথ্যে হোক, তবু সেটা সত্য।'

কথা দুটি ভেবে দেখা উচিত।

প্রথমে মনে রাখা দরকার, সাহিত্যের 'সত্য' যেমন কোনো ধ্রুববস্তু নয়, তারও পরিবর্তন আছে, আছে আপেক্ষিকতা, তেমনি সমালোচনা সাহিত্যেরও। তথ্য অনেক সময়ই তত্ত্বের বিরোধী হয়ে দেখা দেয়। যেমন, ঔপন্যাসিকের জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকা দরকার একথা সবাই বলেন— তা কবি, নাট্যকার, কার নয়? এ সম্বন্ধে দুই বিপরীত উদাহরণ আছে। শোনা যায়, জেন অস্টেন তার উপন্যাসে কখনো দুই পুরুষের বিশ্রব্ধ আলাপ চিত্রিত করেন নি, কারণ, নারী হিসেবে এ সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকার কথা নয় (ভদ্রমহিলার আড়িপাতা অভ্যাস ছিল না দেখছি)। আবার ড্যানিয়েল ডিফো সমুদ্র-যাত্রা করা তো দূরের কথা, সমুদ্র না দেখেই লিখে ফেলেছিলেন রবিনসন ক্রুশো'র মতো হার্দ্য উপন্যাস (আমরা ভুলে যাচ্ছি কেন যে ইংরেজ নাবিকের জাত এবং ডিফোর

পাশের বাড়িতেই নাবিক থাকা সম্ভব, সমুদ্র-সাহিত্য তো ভুরি ভুরি)। জগদীশ গুপ্ত স্বাভাবিক কারণেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় অভিযোগে দারুণ re-act করেছিলেন,

... লোকালয়ের যে চৌহদ্দির মধ্যে এতকাল" আমাকে কাটাইতে হইয়াছে সেখানে "স্বভাবসিদ্ধ ইতর" এবং "কোমরবাঁধা শয়তান" নিশ্চয়ই আছে; এবং বোলপুরের টাউন-প্ল্যানিং-এর দোষে যাতায়াতের সময় উঁকি মারতে হয় নাই, "ও-জায়গা" আপনি চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু, তথাপি আমার আপত্তি এই যে, পুস্তকের পরিচয় দিতে বসিয়া লেখকের জীবন-কথা না তুলিলেই ভাল হইত, কারণ উহা সমালোচকের "অবশ্য-দায়িত্বের বাইরে" এবং তাহার "সুস্পষ্ট প্রমাণ" ছিল না।'

জগদীশ গুপ্ত জানাচ্ছেন, তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল; অভিজ্ঞতা ছিল কিনা যেহেতু তা 'সুস্পষ্ট প্রমাণ' করা যায় না, তখন লেখকের কথা টেনে না এনে লেখার ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত (ঠিকই)। এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই কতবার বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'। সুতরাং সমস্যা সমাধানের অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে।

বস্তুত, উপন্যাসের বিষয়বস্তু, প্লট-রচনা, ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ এসবের কোনটির নিজস্ব চরম মূল্য নেই, তার অন্তিম তাৎপর্য রচনার মধ্যেই আছে; আর সেটিকে চিনে নেওয়া যায় লেখকের মানসিকতার আলোকে। জগদীশ গুপ্তের মনোলোকের পরিচয় নিতে গিয়ে আমরা দেখেছি, তিনি বিনাশের শিল্পী হলেও প্রচলিত অর্থে ট্র্যাজেডি রচনা করেন নি, ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক তিনি দেখান নি,— সুতরাং আদ্যন্ত পূর্ণ-বিকশিত চরিত্রসৃষ্টিরও দায় ছিল না তাঁর। কপালকুণ্ডলা প্রতাপ কুন্দ গোরা হেমনলিনী কুমু মেজদি রাজলক্ষ্মী— এদের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, জগদীশ গুপ্তের রচনায় এমন একটিও চরিত্র নেই। তার কারণ, ব্যক্তি মানুষকে পূর্ণরূপে তিনি দেখতেই পান না, ঘটনাবলীর সংঘাতে তাকে একটা শ্লেষাত্মক প্যাটার্ন বুনে হঠাৎ অন্তর্হিত হতে দেখেছেন। এদিক থেকে তাঁকে রূপসাধক শিল্পী অপেক্ষা জীবন ভাষ্যকার হিসেবেই বেশি দেখা যায়— এই জন্যই কি তিনি গল্প লিখেও প্রবন্ধকার হিসেবে গণনীয় হতে আপত্তি করেন নি? (উদ্ধৃতি আগেই নিয়েছি) বস্তুত, তাঁর চরিত্রগুলি ক্ল্যাসিকাল আদর্শে খণ্ডিত কিন্তু তাঁর নিজের আলোকে পর্যাপ্ত; অতএব সার্থক।

উপন্যাসে সাধারণত একরঙা এবং জটিল দু'ধরনের চরিত্রই দেখা যায়। জগদীশ গুপ্তের রচনায় জটিল চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে না, সবই এক রঙা চরিত্র। *গৃহদাহ*-এর অচলার মতো তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে পাপ-পুণ্য, ভালো-মন্দের দ্বন্দ্ব নেই, আছে আবর্তন, সেই আবর্তনের পাকে পাপ-পুণ্যের মধ্যে যুগ্মতা আছে, পর্যায় আছে, আছে পরস্পর সাপেক্ষতা— এবং সেটাই জগদীশ গুপ্তের কৃত্য।

বস্তুত, সমকালীনতার অমোঘ হস্তক্ষেপে নায়কের মৃত্যু (Death of a Hero) অনেক আগেই ঘটেছিল আধুনিক পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসে— জীবনরসিকতা অপেক্ষা জীবনবীক্ষাই

হয়েছিল প্রধান (তুলনীয়, লরেন্স, হাক্স্‌লি, ডস্টয়েভস্কি, টমাস মান)— জগদীশ গুপ্তের রচনায় তার নজির পেলে অর্থাৎ ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে পূর্ণবিকশিত চরিত্র না পেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাঁকে Schematic বললেও তিনি মৃদু মৃদু হাসতে থাকবেন।

কিন্তু তাই বলে জগদীশ গুপ্তের রচনায় human interest-এর অভাব একটুও আছে তা নয়। বিচিত্র মানবসংঘের অবতারণা করেছেন লেখক, এবং সেসব মানুষ জীবনানন্দ যাকে বলেছেন 'যুথচারী', জড়াজড়ি করা পিঁপড়ের মতো এরা পরস্পরের উপরে উঠছে, নিচে নামছে, খাদ্যকণা সংগ্রহ করছে, কখনো অপরে তা কেড়ে নিচ্ছে, কখনো শুঁড়ে শুঁড়ে ছুঁয়ে মিতালি করছে। এসব ক্ষেত্রে মানুষ চকিত আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে, যদিও আগায়-গোড়ায় খণ্ডিত, কিন্তু যতটুকু দেখা যায় ততটুকুতেই প্রাণবন্ত। দীনবন্ধু মিত্র যেমন তুলির দু'একটা টানে একটা গোটা মানুষের আভাস এনে দিতে পারতেন জগদীশ গুপ্তের রচনাতেও তাই হয়েছে। আমরা এই রকম সামান্য দু'একটি উদ্ধৃত করছি :

কিন্তু টুকীর আঁচল গায়ে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলেই খসিয়া পড়িতেছে। টুকী আঁচল ধরিয়া বাড়ী গেল— এবং ইহাই লইয়া পাড়ার ঐ মেয়েদের সেদিন প্রায় একটা বেলা কাটিল। (*'লঘু-গুরু'*)

ননী, দিদি আমার, আর এক পেয়ালা— যদি পারো, যদি অসুবিধে না হয়, যদি— অজয়া যোগাইয়া দিল,— না ঘুমিয়ে থাকো।

ননী পাশের ঘর হইতে বলিল, —ঘুমুইনি, আনছি। (*অসাধু সিদ্ধার্থ*)

সুখী বলিল,— মাগী বলছ কাকে, হাকিম? হাকিমী করছ, মানুষের সঙ্গে কথা কইতে শেখনি!... মেয়ে-মনুষকে খবদ্দার মাগী-মাগী ক'রো না... তোমার মা-বোন কি?— বলিয়া সুখী তার ড্যাবা ড্যাবা চোখ দু'টাকে ঘরময় ঘুরাইয়া আনিল এবং অবশেষে হাকিমকে লট্‌কাইয়া তুলিয়া কোথায় ধরিয়া রাখিল কে জানে। (*তাতল সৈকতে*)

শরৎ যেন অতর্কিত আঘাত খাইয়া লাফাইয়া উঠিল; চেঁচাইতে লাগিল,— চিত্ত, শান্তকে সরিয়ে নে যা; যা, যা— এক মুহূর্ত দেরী করিসনে... মাথা খাস, ওর কানে যেন এ-কথা না যায়। ... বলিতে বলিতে ছুটিয়া যাইয়া সে দুই হাতে শান্তর দুই কান বন্ধ করিয়া ধরিল; তারপর তাহাকে ঠেলিয়া আনিয়া চিত্তকে আর শান্তকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিল.. চোখের পলক না পড়িতেই যেন একটা ঝড় বহিয়া গেল। (ঐ)

**চার**

জগদীশ গুপ্তের মানসিকতা অনন্য কিন্তু তা আকাশ থেকে পড়া কিছু নয়, তিনি নিতান্ত উৎকেন্দ্রিকও নন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের মৃত্তিকাতেই তাঁর কল্পনার বীজ অঙ্কুর মেলেছিল। মানুষের ট্র্যাডিশন্যাল (শাশ্বত) মূল্যবোধ তখনকার সংকটে গজভুক্তকপিত্থবৎ প্রতিপন্ন হয়েছিল, যার ফলে মানুষকে, তার সমস্ত চেষ্টিতকে এই রকমই অন্তিম

তাৎপর্যহীন, অসার বলেই মনে হয়েছিল। ফ্রান্সে যন্ত্রনির্ভর আধুনিক ধনিক সভ্যতার অভ্যাগমে Naturalist-দের গুরু এমিল জোলা *Germinal* লিখেছিলেন। এলিয়টের কাছে উপলব্ধ হয়েছিল *Wasteland*-এর রূপক, সব সারবত্তার নিষ্কাশনে দেখা দিল *Hollowmen* এবং প্রেমের সন্ধ্যা দেখা দিয়েছিল like a patient etherised upon a table। এই যুগেরই কবি সুধীন্দ্রনাথ অতিক্রান্ত শতাব্দীর 'পৈতৃক বিধাতা'-র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 'দাও মোরে ফিরে দাও অগ্রজের অটল বিশ্বাস' এবং তীব্র যন্ত্রণায় সচেতন হয়েছিলেন যে 'আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে.../আমাদের 'পরে দেনা শোধবার ভার।'

জীবনানন্দও জীবনের তথাকথিত পূর্ণতা ও বিনাশকে সমপাতী করে দেখেছিলেন, জগদীশ গুপ্তের মতো তিনিও কার্যকারণের পশ্চাতে ছোটেন নি :

'বধূ শুয়েছিলো পাশে— শিশুটিও ছিলো;/প্রেম ছিলো, আশা ছিলো— জ্যোৎস্নায়, — তবু সে দেখিলো/কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেলো তার?/অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল— লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার'।

এবং জীবনের স্তরে স্তরে শাদা-কালোর আবর্তনের কথা স্বীকার করে লিখলেন, 'রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি।'

এমন কি রবীন্দ্রনাথও। অন্তহীন প্রয়াস ও অন্তহীন বিফলতার চূড়ান্ত রূপ এঁকেছেন তিনি 'রাহুর প্রেম' কবিতায় :

'নিত্যকালের সঙ্গী আমি যে, আমি যে রে তোর ছায়া;/কিবা সে রোদনে, কিবা সে হাসিতে,/দেখিতে পাইবি কখনো পাশেতে/কভু সম্মুখে কভু পশ্চাতে আমার আঁধার কায়া।'

এ কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচনা, শেষ বয়সেও একই উপলব্ধি তিনি চেতনার ভিত্তিরূপে পেয়েছেন :

'মৃত্যু দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত/রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা—'

বলা বাহুল্য, জগদীশ গুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার পরিণত ফল মোটেই এক নয়, বরঞ্চ বিপরীত। কিন্তু লক্ষণীয় যে বড় ছোট সব ফুলের গাছই আধুনিক কালের একই জীবনবীক্ষার ভূমি থেকে রস আহরণ করেছে।

তাহলে, জগদীশ গুপ্তের প্রকৃতি এত উদ্ভটরূপে স্বতন্ত্র কেন? তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কি কোনো খর্বতা আছে? এক সমালোচক সেদিকেও অঙ্গুল-নির্দেশ করেছেন, 'জগদীশচন্দ্রের লেখা পড়িলে মনে হয় মানুষের মধ্যে শয়তানটাই একমাত্র সত্য। ...প্রাণের রস শুকাইয়া যায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, আতঙ্কে মন বিষাক্ত হইয়া উঠে।... কিন্তু আমাদের মধ্যে এই শয়তানী ভাবটা দূর করা, আমাদের রুচিকে উন্নত ও মার্জিত করাই সৎ-সাহিত্যের কার্য নহে কি?' (অনিলবরণ রায়)

কোন শিল্পী কোন কার্যের দায়িত্বভার নিজের ওপর তুলে নেবেন সেটা তাঁর নিজের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। রিয়ালিটির একটি পর্যায় তিনি অভ্রান্তভাবে ধরেছেন, তা অন্য কবি শিল্পীদের সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যায়। কিন্তু অন্যরা যেখানে অন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন,— এবং সেটাও রিয়ালিটির একটা রঙ, রবীন্দ্রনাথের অন্তিম আনন্দময়তা পর্যন্ত— জগদীশ গুপ্ত সেখানে নিজের প্রতিই আনুগত্য বজায় রেখেছেন। নিজের কথা বলতে তিনি সর্বদাই কুণ্ঠিত ছিলেন, পাঠককে শুধু এইটুকু অনুরোধ করেছেন লেখকের প্রতি নয়, লেখার প্রতি মনোযোগী হতে : 'আমার লেখা পড়িবার সময়... পাঠক লক্ষ করিবেন, জীবন্ত কোনো রসাশ্রিত সামগ্রী আমি তাঁহাদের উপভোগের জন্য দিতে পারিয়াছি কি না।'

দিতে পেরেছেন কি?

রবীন্দ্রনাথ বিপুলা পৃথিবীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, '... এক ক্ষুদ্র অংশে কোনো একটি আসনের/সত্য মূল্য যদি দিয়ে থাকি,... /তবে দিয়ো তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে';

এর অনুসরণে বলা যায়, জগদীশ গুপ্ত রিয়ালিটির একটি অংশের সত্য চিত্র অতুলনীয় আন্তরিকতার সঙ্গেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং অনন্য সার্থকতার তিলকও ললাটে ধারণ করবার অধিকার অর্জন করেছিলেন।

সূত্র : *জলার্ক*, চৈত্র ১৩৮৮